১.১. ভূমিকা (Introduction) : তত্ত্ব ও প্রয়োগ (Theory and Practice)

সাধারণভাবে বলা হয়, নীতিশাস্ত্র বা নীতিবিদ্যা হল মানুষের চরিত্র অথবা চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ আচরণের 'ভালত্ব' ও 'মন্দত্ব' সংক্রান্ত বিজ্ঞান। পাশ্চাত্যের নীতিবিদ ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) নীতিবিদ্যার সংজ্ঞায় বলেছেন, 'নীতিবিদ্যা হল মানুষের আচরণের ঔচিত্য বা ভালত্বের আলোচনা।' অনুরূপভাবে, নীতিবিদ্যার সংজ্ঞায় 'পাশ্চাত্যের' অধ্যাপক লিলি (Lillie) বলেছেন, 'নীতিবিদ্যা হল, সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় এমন এক আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান যেখানে মানুষের আচরণ উচিত না অনুচিত, ভাল না মন্দ, অথবা অনুরূপ বিচার করা হয়।' নীতিবিদ্যার এ প্রকার সংজ্ঞা থেকে সাধারণভাবে এটাই মনে হয় যে, নীতিবিদ্যা এক তাত্ত্বিক (theoretical) বিজ্ঞান, যেখানে কোন আদর্শের (norm or ideal) প্রেক্ষিতে মানুষের আচরণ ভাল না মন্দ তার আলোচনাই করা হয়, মানুষকে ঐ আদর্শসম্মতভাবে গঠন করার কোন প্রচেষ্টা নীতিবিদ্যায় থাকে না, অর্থাৎ ব্যবহারিক (Practical) দিকটি নীতিবিদ্যায় উপেক্ষিত হয়।

ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি সংশ্লেষণাত্মক। ভারতীয় দর্শনের সকল শাখাই তাত্ত্বিক (theoretical) ও প্রায়োগিক (practical) উভয় দিকের প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শন কেবল সত্যের অনুসন্ধান, জ্ঞানের জন্য জ্ঞান অন্বেষণ। ভারতীয় দর্শন কেবল সত্যের অনুসন্ধান নয়, জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠাও। ভারতীয় দার্শনিকের কাছে দর্শন কেবল তত্ত্বচর্চা নয়, জীবনচর্যাও। যে তত্ত্বচর্চার সঙ্গে জীবনচর্যার কোন যোগ নেই, ভারতীয় দর্শনে তা অসার ও নিষ্ফলরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে। যথাযোগ্য জীবন-যাপনের (নীতি) জন্য সত্যজ্ঞানের (তত্ত্বজ্ঞানের) প্রয়োজন। তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে জীবনকে সত্য সুন্দর ও কল্যাণময় করাই হল ভারতীয় দার্শনিকের অভীষ্ট।

এখানেই পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান পার্থক্য। **পাশ্চাত্যে তত্ত্বজ্ঞান দার্শনিকের জীবনকে তেমন প্রভাবিত করে না, সেখানে তত্ত্বকে জানাই হল দার্শনিকের অভীষ্ট।** পাশ্চাত্যের দার্শনিককে যদি 'জ্ঞানী' বলা হয়, তাহলে ভারতীয় দার্শনিককে বলতে হয় 'সত্যদ্রষ্টা ঋষি', যিনি তাঁর জ্ঞানের আলোকে জীবনকে রূপায়িত করেন (ব্যবহারিক দিক—নৈতিক দিক)। ভারতের বিভিন্ন দর্শন শাখার সমর্থক তাঁদের নিজ নিজ সত্যজ্ঞানের আলোকে জীবনকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন—জৈন, বৌদ্ধ, মীমাংসক,

বৈদান্তিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ তাঁদের নিজ নিজ সত্য-উপলব্ধি অনুসারে জীবনযাত্রা প্রণালী নির্বাহ করেন এবং ঐ প্রকার জীবনযাত্রা নির্বাহের সঙ্গেই তাঁরা ইষ্ট-অনিষ্ট, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি নৈতিক বিশেষণকে যুক্ত করেন। স্পষ্টতই, **ভারতীয় নীতিশাস্ত্র একই সঙ্গে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক।**

সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ভারতীয় দার্শনিক নীতি, ধর্ম ইত্যাদিকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেননি, দর্শনের অঙ্গিভূতরূপে আলোচনা করেছেন। নৈতিক 'ভাল-মন্দের' আলোচনা তত্ত্বালোচনার মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি—নৈতিক আলোচনার সঙ্গে অধিবিদ্যক আলোচনা, আধ্যাত্মিক আলোচনাও যুক্ত হয়েছে। এর ফলে, নৈতিক পরমাদর্শ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে তেমন কোন মতভেদ দেখা দেয়নি। পাশ্চাত্যের নৈতিক ভাল-মন্দের আলোচনার সঙ্গে অধিবিদ্যক ও আধ্যাত্মিক আলোচনা যুক্ত না হওয়ায় সেখানে নৈতিক মতবাদ বস্তুতান্ত্রিক মতবাদে, কখনো ভোগবাদে পরিণত হয়েছে। এর ফলে, পাশ্চাত্যের নীতিবিদগণ নৈতিক পরমাদর্শ সম্পর্কে কোন ঐক্যমত পোষণ করতে পারেননি। তাছাড়া বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদে মানুষের কপটতা, ভ্রষ্টাচার বৃদ্ধি পায়, সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠা পায় না। ভারতীয় ধ্যান-ধারণা অনুসরণ করে তাই সমাজে নৈতিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে নৈতিক 'ভাল-মন্দের' বিচারের সঙ্গে আধ্যাত্মিক দিকটিকেও যুক্ত করে বলতে হবে, মানুষের যে কাজ তার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষলাভের সহায়ক তা 'ভাল' বা 'উচিত কাজ' এবং যে কাজ তার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষলাভের অন্তরায় তা 'মন্দ' বা 'অনুচিত' কাজ।

১.২. ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য (Special features of Indian Ethics)

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের এমন কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য তাকে পাশ্চাত্যের নীতিবিদ্যা থেকে সহজেই ভিন্ন করা চলে। তবে, উভয় ক্ষেত্রে 'মানুষের আচরণের নৈতিক বিচার' আলোচ্য বিষয় হওয়ায় তাদের মধ্যে, যেমন ভিন্নতা আছে, তেমনি অভিন্নতাও আছে। অর্থাৎ ভারতীয় নীতিশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা যেমন দুটি বিপরীত মেরুর বিরুদ্ধধর্মী নৈতিক মতবাদ নয়, তেমনি আবার তারা সব ব্যাপারে অভিন্ন মতবাদও পোষণ করে না। পাশ্চাত্যের নীতিবিদ্যার সঙ্গে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের পার্থক্য নির্দেশ করতে হলে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে হয়। যথা—

১. প্রাচীনতা (Remoteness in time),
২. ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি (Practicality),
৩. অধিবিদ্যক ভিত্তি (Metaphysical basis)
৪. নিরপেক্ষতা (Absoluteness)।

প্রথমত, মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভারতীয় নীতিদর্শনই প্রাচীনতম। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বেদ-উপনিষদই জগতের প্রাচীনতম সাহিত্য এবং ভারতীয় দর্শনের তথা নীতিদর্শনের ভিত্তিভূমি হল বেদোপনিষদ। হিন্দুশাস্ত্রসমুহের এবং মীমাংসার সুসংহত নৈতিক মতবাদের মূল হল প্রাচীন ভারতের বেদ এবং উপনিষদ। ঋক্-বেদের 'মন্ত্র'সমূহে যেমন

'অলঙ্ঘ্য-নৈতিক নিয়মের' (universal moral law) উল্লেখ আছে তেমনি 'অহিংসা', 'বর্ণ', 'ধর্ম' এবং 'আশ্রম ধর্মের'ও উল্লেখ আছে এবং এসবই হল ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর। পাশ্চাত্যের যেসব পণ্ডিত গ্রীসের (Greece) নৈতিক মতবাদকে প্রাচীনতম বলেন তাঁদের অভিমত গ্রহণ করা চলে না, কেননা সর্বসম্মত অভিমত হল, প্রাচীন গ্রীসের দর্শন-চিন্তার উৎপত্তির অনেক পূর্বেই ঋক-বেদের আবির্ভাব ঘটেছে।

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের **এই প্রাচীনতার জন্যই নৈতিক মতবাদগুলি ভারতবাসীর ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়েছে—চর্চার সঙ্গে চর্যাও যুক্ত হয়েছে।** কয়েক সহস্র বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর আজও ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের অনুগামীরা জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের নৈতিক ধ্যান-ধারণা অনুসারে তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপন করে চলেছে।

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের এই 'ব্যবহারিক' (practical) দিকটি পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় উপেক্ষিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের নীতিবিদ্যা মূলত জ্ঞানাত্মক (cognitive), যেখানে নৈতিক প্রত্যয়গুলির (ethical concepts) স্পষ্টীকরণ করা হয়। 'ন্যায়' কী? 'ভাল' কী? 'যথোচিত কর্ম' কাকে বলে? 'নৈতিক পরমাদর্শের' (summun bonum) স্বরূপ কী?—এইসব প্রশ্নের তাত্ত্বিক মীমাংসাই নীতিবিদ্যার লক্ষ্য। 'ন্যায়'কে, 'ভাল'কে জীবনে প্রতিষ্ঠা করা, 'যথোচিত কর্মকে' সম্পাদন করা এবং নৈতিক পরমাদর্শকে লাভ করার জন্য আত্মিক উৎকর্ষ সাধন করার কোন প্রচেষ্টা পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় নেই। **পাশ্চাত্যের নীতিবিদ্যায় জ্ঞানচর্চাই মুখ্য, জীবনচর্যা উপেক্ষিত।** ভারতীয় নীতিশাস্ত্র এমন নয়। **ভারতীয় নীতিশাস্ত্র মানুষকে কেবল নৈতিকজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে না, সেই সঙ্গে নীতিনিষ্ঠ হবার জন্য বিশেষ ধরনের** জীবনচর্যাকেও **অনুসরণ করতে বলে।** সৎকর্ম সাধনের জন্য এবং সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভারতীয় নীতিশাস্ত্র মানুষকে চতুর্বর্গ পুরুষার্থ সাধনের (অর্থ, কাম, ধর্ম, মোক্ষ সাধনের), বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসরণের (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস অনুসরণের) নির্দেশ দেয়। **ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে তাই জ্ঞান এবং কর্মের ওপর, তত্ত্ব ও প্রয়োগের ওপর, চর্চা ও চর্যার ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়।** ভারতীয় নীতিশাস্ত্রবিদ্‌দের মতে, যে জ্ঞান মানুষের জীবনকে উন্নত করে না, মানুষের মনকে শুদ্ধ করে না, মানুষকে পরার্থে নিয়োজিত করে না, তা বন্ধ্যা, নিষ্ফলা। এমন জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের **সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অধিবিদ্যক ভিত্তিভূমি।** ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ভগবদ্‌গীতার ভিত্তিভূমিও হল, অধিবিদ্যক পরমাত্মা ঈশ্বর, এবং জীবাত্মা ঐ পরমাত্মারই প্রকাশ। ভীষ্ম-দ্রোণাদি স্বজনবর্গের হত্যাজনিত পাপ থেকে বিরত হবার জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভের প্রাক্‌কালে অর্জুন অস্ত্রত্যাগ করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে উদ্বোধিত করার জন্য বলেন, 'ভীষ্ম-দ্রোণাদির মধ্যে এক অবিনাশি আত্মার প্রকাশ, যা নিজে হত হয় না, অন্যকেও নিহত করে না (নায়ং হন্তি ন হন্যতেঃ ২ - ১৯)। জড় দেহেরই (প্রকৃতি-সম্ভূত) মৃত্যু আছে। ভীষ্ম-দ্রোণাদির আত্মা অজ (যার জন্ম নেই), অমর, নিত্য, শাশ্বত। অতএব হে অর্জুন ধর্ম রক্ষার্থে অস্ত্র গ্রহণপূর্বক যুদ্ধ কর। **স্থিতপ্রজ্ঞ কর্মযোগী কর্মফলের, ইষ্ট-অনিষ্টের, চিন্তা না করে কর্মকেই তাঁর ধর্মরূপে**

গণ্য করেন। তুমিও তদ্রূপ সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, প্রশংসা-নিন্দা, কল্যাণ-অকল্যাণ, ইত্যাদি কর্মফল আমাকে সমর্পণ করে ক্ষাত্রধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ কর।'

নৈতিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে এই প্রকারে অধিবিদ্যক তত্ত্ব যুক্ত হওয়ায় ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে তত্ত্ব ও প্রয়োগের প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের চরম লক্ষ্য বা পরমার্থ বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ নয়, তা হল সত্যজ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষ বা মুক্তি লাভ। মোক্ষ বা মুক্তি লাভের পর আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে এবং স্বরূপত আত্মা হল নিত্য, শাশ্বত, অনাদি, অনন্ত, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ইত্যাদি।

চতুর্থত, অধিবিদ্যক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যুক্ত হওয়ার ফলে **ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে নৈতিক পরমার্থ সম্পর্কে সকলেই অভিন্ন মত পোষণ করেন।** পাশ্চাত্যের নীতিবিদ্যার সঙ্গে অধিবিদ্যার তেমন যোগ না থাকায় সেখানে নৈতিক জীবনের পরমাদর্শ সম্পর্কে সকলে অভিন্ন মত পোষণ করেন না। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রবিদ্‌দের মতে, নৈতিক জীবনের লক্ষ্য ব্যবহারিক জীবনের বৈভব বা ঐশ্বর্য নয়, দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়, তাহল আত্মিক বা আধ্যাত্মিক পূর্ণতালাভ, মোক্ষপ্রাপ্তি। এ ব্যাপারে (চার্বাক ব্যতীত), ভারতীয় নীতিশাস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। **ভারতীয় নীতিশাস্ত্রসম্মত নৈতিকতা এক নিরক্ষেপ নৈতিকতা (absolute ethics)।** পক্ষান্তরে, পশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় নৈতিক জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঐক্যমত নেই। অনেকের মতে, নৈতিক জীবনের লক্ষ্য হল সুখলাভ; অনেকের মতে, নৈতিক জীবনের লক্ষ্য হল সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কর্ম সাধন; আবার অনেকের মতে, নৈতিক জীবনের লক্ষ্য হল আত্মিক উৎকর্ষ লাভ। এ প্রকার মতভেদের জন্য পাশ্চাত্যের নীতিবিদ্যাসম্মত নৈতিকতা নিরপেক্ষ নয়, **সাপেক্ষ নৈতিকতা** (relative ethics)।

১.৩. ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে বেদ-উপনিষদের প্রভাব (Vedic-Upanisadic influence on Indian Ethics)

ভারতীয় নীতিশাস্ত্র বেদ-নির্ভর এবং বিশেষ করে বেদের অন্তভাগ উপনিষদ-নির্ভর। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে মানুষের সামাজিক অবস্থানরূপে যে **চতুর্বর্ণের** উল্লেখ করা হয়েছে এবং সর্বোপরি মানুষের কাম্যরূপে যে **চতুর্বর্গ পুরুষার্থের** উল্লেখ করা হয়েছে সেসবই বেদ এবং বিশেষ করে উপনিষদসম্মত। আবার, বেদ ও উপনিষদকে অনুসরণ করে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে বলা হয় যে, আত্মা বা ব্রহ্মই পরমার্থসৎ এবং সবই ঐ আত্মা বা ব্রহ্মের প্রকাশ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ নেই—**জীবাত্মার নিজেকে পরমাত্মারূপে উপলব্ধি করাই হল মানবজীবনের চরম ও পরম অভীষ্ট—ঐ অভীষ্ট লাভের পথকে যেসব কাজ সুগম করে তাই নৈতিক কাজ, যেসব কাজ ঐ অভীষ্ট লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে তা গর্হিত কাজ।**

স্পষ্টতই, **ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে ব্যক্তির সংকীর্ণ স্বার্থ-সাধন জীবনের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হল আত্মোপলব্ধি, যে উপলব্ধি হলে মানুষ পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে উন্নীত হয়, আত্মসুখকে প্রশ্রয় না দিয়ে সর্বসুখকে কামনা করে, শুধু মানুষের নয়, সকল জীবের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়।** ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের এই সার কথাই ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে, 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু য

পশ্যতি স পণ্ডিতঃ,' অর্থাৎ তিনি সত্যদর্শী ঋষি যিনি সব জীবকে আত্মবৎ অর্থাৎ নিজের মতো মনে করেন। উপনিষদ-সম্মত ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের এই অভিমতের জন্যই ভারতীয় নীতিবিদগণ, বিশেষত জৈন ও বৌদ্ধগণ, অহিংসাকেই পরমধর্মরূপে গণ্য করেছেন।

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের কর্মবাদও উপনিষদ-সম্মত মতবাদ। উপনিষদকে অনুসরণ করেই ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে পরমার্থ লাভ তিনটি পথ ধরে হতে পারে। যথা—জ্ঞানের পথ (জ্ঞানযোগ), কর্মের পথ (কর্মযোগ) এবং ভক্তির পথ (ভক্তিযোগ)। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে তাই উপনিষদের প্রভাবকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় না।

উপনিষদকে অনুকরণ করেই হিন্দু* নীতিশাস্ত্রে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের অগ্রগতির জন্য মানবজীবনের তিনটি স্তরের উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—**সামাজিকভাবে** নৈতিক জীবন, ব্যক্তিগতভাবে নৈতিক জীবন এবং **পরমার্থিক** নৈতিক জীবন, 'হিন্দু নীতিশাস্ত্র তাই একই সঙ্গে সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পরকাষ্ঠারূপে পরমার্থিক।'[১]

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের **সামাজিক দিকটি বর্ণাশ্রমধর্মের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে।** এখানে 'ধর্ম' অর্থে 'কর্ম'—'কর্তব্যকর্ম'। বর্ণধর্মে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত মানুষের কর্তব্যকর্মের এবং আশ্রমধর্মের মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যক্তির কর্তব্যকর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, **এসব ধর্ম বা কর্তব্যকর্ম সাধারণ বা নিরপেক্ষ নয়, সাপেক্ষ—বর্ণ-সাপেক্ষ বা আশ্রম-সাপেক্ষ।** এসব কর্তব্যকর্ম ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা, তার দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতি, মেজাজ, মননশীলতা, বিশেষ সামর্থ্য ও দক্ষতা ইত্যাদি অনুসারে নির্ধারিত হয়।

বর্ণাশ্রমধর্ম তাই সাধারণধর্ম থেকে স্বতন্ত্র। সাধারণধর্ম বা কর্তব্যকর্ম হল সব মানুষের আবশ্যিক কর্তব্যকর্ম—বর্ণ ও আশ্রম-নির্বিশেষে সব মানুষের সাধারণ কর্তব্যকর্ম, সামাজিক মর্যাদা ও তার সামর্থ্য নিরপেক্ষভাবে সমাজের প্রত্যেক মানুষের আবশ্যিক কর্তব্যকর্ম। ধৃতি বা ধৈর্য, ক্ষমা, দম বা ইন্দ্রিয়দমন, চৌর্যাভাব (চুরি না করার ইচ্ছা), শুচিতা, ধী বা জ্ঞান, বিদ্যা, সত্যবাদিতা, অক্রোধ ইত্যাদি হল সাধারণধর্ম বা সব মানুষের কর্তব্যকর্ম। **সাধারণধর্ম হল সব মানুষের নিঃশর্ত কর্তব্যকর্ম।**

বর্ণাশ্রমধর্ম সাধারণধর্মের মতো নিঃশর্ত নয়, তা হল শর্তসাপেক্ষ ধর্ম বা কর্তব্যকর্ম। বর্ণধর্ম হল ব্যক্তির বর্ণ অনুসারে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণ অনুসারে) কর্তব্যকর্ম। তেমনি, আশ্রমধর্ম হল ব্যক্তির আশ্রম অনুসারে (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার পর্যায় অনুসারে) কর্তব্যকর্ম। কাজেই বর্ণাশ্রমধর্ম সব মানুষের কাছে নিঃশর্তভাবে পালনীয় নয়, বর্ণ ও আশ্রম-সাপেক্ষরূপে পালনীয়।

তবে, বর্ণাশ্রমধর্ম সাধারণ ধর্মের মতো নিঃশর্ত না হলেও কোন বর্ণের অন্তর্গত সব ব্যক্তির কাছে অথবা কোন আশ্রমের অন্তর্গত সব ব্যক্তির কাছে তা নিঃশর্তভাবে পালনীয়; অর্থাৎ **বর্ণাশ্রমধর্ম এক দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন শর্তযুক্ত, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে তেমনি আবার নিঃশর্ত।** বর্ণাশ্রমধর্ম বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে নির্ধারিত ব্যক্তির কর্তব্যকর্ম—'যদি-তাহলে'

---

* 'হিন্দু' বলতে বিশেষ কোন ধর্ম সম্প্রদায়কে বোঝায় না, বোঝায় ভারতীয় ভূখণ্ডের অধিবাসী ভারতীয়দের।

১. 'Hindu Ethics is the social ethics and psychological ethics and culminates in the philosophy of the Absolute which is the consumation of the Spiritual life.' The Ethics of the Hindus. S. K. Maitra. P.I, University of Calcutta. 1963.

শর্তযুক্ত কর্তব্যকর্ম। এখানে সমাজের নির্দেশটি হল, 'যদি তুমি এই বর্ণের অথবা আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হও তাহলে তোমাকে এইসব বিশেষ কর্ম সাধন করতে হবে।' স্পষ্টতই, এখানে সমাজের নির্দেশটি নিঃশর্ত নয়, তা হল শর্তযুক্ত। তেমনি আবার বিশেষ কোন বর্ণ অথবা আশ্রমভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে তার বর্ণ অথবা আশ্রম অনুসারে নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম নিঃশর্ত, অবশ্য পালনীয়। এখানে সমাজের নির্দেশটি হল, 'তুমি যখন ক্ষত্রিয়বর্ণভুক্ত তখন ক্ষাত্রধর্ম তোমার অবশ্য পালনীয়'; 'তুমি যখন গৃহস্থ আশ্রমভুক্ত তখন গার্হস্থ্যকর্তব্য তোমার অবশ্য পালনীয়।'

উপনিষদকে অনুসরণ করে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে সাধারণধর্ম ও বর্ণাশ্রমধর্মের মাধ্যমে একথাই বলা হয়েছে যে, **প্রত্যেক মানুষের পরমধর্ম হল বিশ্ববাসীর কল্যাণসাধন।** ধৈর্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়দমন, চৌর্যাভাব, শুচিতা, জ্ঞান, বিদ্যা, সত্যবাদিতা, অক্রোধ ইত্যাদি সাধারণ ধর্ম অনুসরণ না করলে বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। আবার নিজ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণসাধনের মাধ্যমেই বিশ্ববাসীর কল্যাণসাধন সম্ভব। এজন্য সাধারণধর্ম অনুসরণের সঙ্গে বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে নির্ধারিত ধর্মকেও (কর্তব্যকর্মকেও) অনুসরণ করতে হয়।

'সাধারণধর্ম ও বর্ণাশ্রমধর্ম হল মিলিতভাবে হিন্দু (ভারতীয়) নীতিশাস্ত্রের বিষয়গত নৈতিকতা, যেখানে সমাজসম্মত প্রথা অনুসরণ করে কর্তব্যসাধন করা হয়।'[১] অর্থাৎ এদুটি ধর্ম একত্রে হল **সামাজিক নৈতিকতা;** কিন্তু বিষয়গত নৈতিকতা বা সামাজিক নৈতিকতা ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়। **সামাজিক কর্তব্যসাধন (বর্ণাশ্রমধর্ম) ও আত্মসংযম অভ্যাসের (সাধারণধর্ম) পর ব্যক্তিকে আত্মমুখী হয়ে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে,** অন্তরের কামনা বাসনাকে অমলিন করতে হবে। **এটাই হল ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের ব্যক্তিগত বা আত্মগত দিক** (subjective morality)।

অন্তরশুদ্ধিও, ভারতীয় নীতিশাস্ত্র অনুসারে, ব্যক্তির জীবনের চরম নৈতিক পরাকাষ্ঠা নয়, চরম লক্ষ্য বা পরাকাষ্ঠা হল, আত্মদর্শন, আত্মাতে সত্যদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন—সর্বভূতে আত্মা বা ব্রহ্ম বিরাজমান, এমন উপলব্ধি। এটাই হল **পরমার্থিক নৈতিকতা** (absolute morality)। নিজ আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন হলে ব্যক্তির জীবনে আর আত্ম-পর ভেদ থাকে না ; স্বার্থ-পরার্থের সংঘাত থাকে না, চিৎ-অচিতের পার্থক্য থাকে না ; ব্যক্তি তখন সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, পাওয়া-না-পাওয়ার ঊর্ধ্বে অবস্থান ক'রে নিরন্তর কল্যাণকর্মে নিয়োজিত থেকে ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন এবং এটাই হল নৈতিক জীবনের পরাকাষ্ঠা।